Vidyasagar University Journal *of* History, Volume VII, 2018-2019, Pages: 132-145
ISSN 2321-0834

# প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রাণিবিজ্ঞান চেতনা ও চর্চার বিবর্তন

ঝিনুক সরকার

*প্রাচীন ভারতীয় কালানুক্রমিক ইতিহাসের মূল ধারায় মানুষের সাথে মনুষ্যেতর প্রাণীদের পারস্পরিক সম্পর্কের আন্তর্বুননের প্রেক্ষাপটে প্রাণিবিজ্ঞান চেতনা ও চর্চার ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের ইতিহাস অনুসন্ধান এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কেবল খাদ্য- খাদকের সম্পর্কে আটকে না থেকে মানুষ গভীর পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতার জোরে বন্য প্রাণীকে পোষ মানাতে শিখেছে প্রতিপালন কৌশল এবং প্রাণিচিকিৎসাবিদ্যা। ফলে বদলেছে মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর সম্পর্কের সমীকরণ। এই বদল একদিকে যেমন প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছে তেমনই প্রাণিবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও অগ্রগতিকে নিশ্চিত করেছে। কিন্তু প্রাণিবিজ্ঞানের এই ইতিহাসচর্চা আজও তুলনামূলক ভাবে উপেক্ষিত ক্ষেত্র। তাই এই লেখায় প্রাগৈতিহাসিক পর্ব থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত সময়সীমায় প্রাণিবিজ্ঞান চেতনা ও চর্চার ইতিহাসের উপর সামান্য আলো ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে।*

***শব্দ সূচক :*** *প্রাণিবিজ্ঞান, গোসম্পদ, ঘোড়া, 'শালিহোত্র সংহিতা', 'অর্থশাস্ত্র'*

পৃথিবী সমস্ত দেশের মত ভারতীয় উপমহাদেশের আদিম মানুষও বেঁচে থাকার জন্য একান্তভাবে নির্ভর করতে পশুশিকার ও খাদ্য সংগ্রহের উপর। দ্বিপাক্ষিক খাদ্য-খাদকের সম্পর্কে কখনও খাবার হিসাবে হিংস্র পশুর পেটে যাবার হাত থেকে বাঁচতে, আবার কখনও পেটের টানে শিকারী হয়ে নিজের খাবার যোগার করতে পশু শিকার করেছে মানু,। এই টিকে থাকার লড়াইয়ে তাই কোথায়, কিভাবে তাদের সহজে বাগে এনে জবাই করা যাবে তা জানাটা ছিল নেহাতই জরুরী। সেই জন্য গভীর পর্যবেক্ষণ দ্বারা মানুষ রপ্ত করেছে প্রাণীদের বিচিত্র স্বভাব, গতিপ্রকৃতি, জীবনধারা সম্পর্কে তীক্ষ্ম জ্ঞান।[১] ফলে মানুষ সর্বপ্রথম যে বিজ্ঞানটি শিখেছিল তা হল প্রাণিবিজ্ঞান। সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে বিজ্ঞানের এই ধারা নানা অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর উপাদানে সমৃদ্ধ হয়েছে, যা সহজেই মনকে নাড়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তথাপি ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চার ইতিহাসে প্রাণিবিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চা এখনও প্রায় অর্বাচীনই রয়ে গেছে। বর্তমান আলোচনায় প্রাগৈতিহাসিক পর্ব থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত সময় পর্বে প্রাণিবিজ্ঞান চর্চার সেই স্বতঃস্ফূর্ত ধারাবাহিকতার কালানুক্রমিক বিবর্তনকে তুলে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

## ১

ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় ব্যবহৃত ঐতিহাসিক উপাদান গুলির দিকে একটু তাকালেই টের পাওয়া যায় প্রাগৈতিহাসিক পর্ব থেকেই মানুষ ও প্রাণীকুলের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক সংঘাত, সহাবস্থান ও সমন্বয়ের সমীকরণ। তাই মধ্যপ্রস্তর ভীমবেটকার গুহাচিত্রে যেমন কখনও দেখা যায একটি বিরাট সিংওয়ালা পশুর তাড়া খেয়ে প্রাণের ভয়ে মানুষ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিচ্ছে, তেমনই আবার দেখা যায় সেই মানুষই হাতি, ঘোড়ার মত দেখতে কোন পশুর পিঠে চেপে অন্য পশুকে শিকার করতে বেরিয়েছে।[২] অর্থাৎ মানুষ শুধু হিংস্র প্রাণী ও পোষ মানানোর যোগ্য প্রাণীর মধ্যে ফারাক করতে শিখেছে তাই নয়, বরং যে প্রাণীটিকে বশ মানাতে পারলে তার ফায়দা বেশী সেই প্রাণীটিকে পোষ মানানোর কৌশলও রপ্ত করে নিয়েছে। অন্যদিকে শিকারের হাতিয়ার হিসাবে প্রয়োজন মাফিক কখনও তীর ধনুক, কখনও গুলতি আবার কখনও

ছিপকে বেছে নেওয়ার মধ্যেও রয়েছে পশুর প্রকৃতিকে অনুধাবন করার মুন্সিয়ানার বিলক্ষণ পরিচয়। শুধু তাই নয়, অবাক হতে হয় কিছু গুহাচিত্রে মেলা এক্সরের মত প্রাণীদের অভ্যন্তরীণ শরীরতন্ত্রের ছবিগুলি দেখে, যা প্রাণীর দেহসংস্থান সম্পর্কে তাদের সম্যক অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়।[৩] তবে এসব কিছুকে ছাপিয়ে প্রাগৈতিহাসিক পর্বের মানুষ ও প্রাণীর সম্পর্কে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে পোষ্য পশুর প্রতিপালনের বিষয়টি।

মধ্যপ্রস্তর পর্বের কাথোটিয়া গুহাচিত্রে রয়েছে একটি শুকরকে খাবার দেওয়ার দৃশ্য।[৪] তবে দিনক্ষণ মেপে বলার উপায় নেই যে, কখন অজান্তে মানুষ প্রয়োজন ও আবেগের সীমারেখা মিলিয়ে এক করে ফেলে পোষ্য পশুটিকে ভালবেসে ফেলেছে; আত্মীয় করে নিয়েছে। তাই বোধহয় নব্যপ্রস্তর পর্বের মহাগড়াতে মানুষের আবাসের পাশে মেলে গরুর খোঁয়াড়।[৫] হয়তো সেখানে রয়েছে প্রিয় পোষ্য প্রাণীটিকে কাছাকাছি রাখার এবং তার নিরাপত্তা বিধান করার তাগিদ। তাছাড়া নব্যপ্রস্তর পর্বীয় বুর্জোহোম, গুফক্রলে মানুষের সাথে এক কবরে কুকুরের কঙ্কালের উপস্থিতির পেছনে পোষ্যের সাথে মালিকের নির্ভেজাল একাত্মতার হেতুকে তুচ্ছ করাও বেশ শক্ত।

২

কথায় আছে ইতিহাস নিজে পুনরাবৃত্তি করে, তাই মেহেড়গড়ের খননকার্যে আকছাড় মেলে ছাগলের কবর দেওয়ার উদাহরণ।[৬] নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়ে যায় মেহেড়গড়ে ছাগল ছিল অন্যতম প্রধান গৃহপালিত প্রাণী। আবার মেহেড়গড়ের বিভিন্ন পর্বে ভেড়ার কঙ্কালের ছড়াছড়ি এবং তাদের আকার আকৃতি ক্রমশ ছোট হয়ে আসার নমুনা থেকে এটা মনে করা অস্বাভাবিক নয় যে, ভেড়া বহুলাংশে পোষা হত বলেই বন্য ভেড়ার আদত চেহারার আদল বর্তমানের ঘরোয়া ছোটখাট চেহারায় বদলে গেছে।[৭] ইতিমধ্যে মানুষও খাদ্যসংগ্রাহক থেকে পশুপালক ও খাদ্য উৎপাদকে উত্তীর্ণ হয়েছে; মেহেড়গড়ে মিলেছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম গ্রামভিত্তিক সমাজের নমুনা। তাই খাবারের যোগানের বিষয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে মানুষ সাজগোজে মন দিয়েছে। তবে সেখানেও প্রাণীদের উপস্থিতি হয়েছে ছায়া সঙ্গী। মেহেড়গড়ের অনেক কবরেই পাওয়া গেছে শামুক, ঝিনুকের খোলা দিয়ে তৈরি অনেক কানের দুল, গলার মালা, বিভিন্ন পশুর দাঁত দিয়ে তৈরি নানান গহনা।[৮] অর্থাৎ মানুষ সৌন্দর্য চেতনাতেও প্রাণীদের মূল্য অনুভব করেছে।

৩

হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রে পাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলির বয়ান থেকে সহজেই বোঝা যায় নগরকেন্দ্রিক সভ্যতাতেও প্রাণীকুলের প্রাসঙ্গিকতা এতটুকুও কমেনি। বরং ততদিনে পশুপাখির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব খাদ্যের চাহিদা মেটানোর সীমানা পেরিয়ে অর্থনীতি, শিল্প চেতনার মত জীবনের বিবিধ আঙিনায় নিজেদের স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছে তাই হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো, বালাকোট ইত্যাদি প্রত্নক্ষেত্রে পাওয়া গেছে অসংখ্য গৃহপালিত পশুর হাড়গোড়। এদের মধ্যে 'জেবু ক্যাটেল' - এর সংখ্যা সব চেয়ে বেশি।[৯] কাজেই মনে করা হয় গরু, মোষ দুধ ও মাংসের যোগান দিত। প্রমাণ স্বরূপ হরপ্পার একটি মাটির ফলকে উঠে আসা মোষকে হত্যা করার ছবির কতা আনা যায়।[১০] আবার কৃষি প্রধান হরপ্পায় বলদ, লাঙল ও মালবাহী দু'চাকার গাড়ি টানত বলে মনে হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা হরপ্পার মাটিতে দু'চাকা গাড়ির চাকার চিহ্ন পেয়েছেন।[১১] এছাড়াও ছাগল, ভেড়া, শুকর, উট ইত্যাদি গৃহ পালিত প্রাণীর কঙ্কালও মিলেছে ঢের। ছাগল ও ভেড়ার মাংস যে খাদ্য তালিকায় ছিল তা এথেকে মনে করা শক্ত নয়। তবে ছাগলের থেকে ভেড়ার হাড়ের নজির শুধু বেশিই নয়, বেশির ভাগ ভেড়ার জীবৎকালও পাঁচ বছরের বেশি বলে প্রত্নতাত্ত্বিকরা প্রমাণ করেছেন। এথেকে সংগত কারণেই মনে হয় মাংসের পাশাপাশি পশমের উৎস হিসাবে ভেড়া পালনের চাহিদা ছিল তুঙ্গে।[১২] আবার হরপ্পার একটি খাপড়ায় আঁকা ছবির নমুনাতে এক জেলের দেখা মেলে, যার হাতে রয়েছে দুটি মাছ ধরার জাল।[১৩] কাজেই হরপ্পাবাসী যে মৎস্য সম্পদ সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ছিল একথা মনে করাই যেতে পারে। তাছাড়া

সমুদ্রতট থেকে অনেক দূরবর্তী অঞ্চল হরপ্পার প্রত্নক্ষেত্রে প্রাপ্ত সামুদ্রিক মাগুর জাতীয় মাছের হাড় থেকে মনে করা হয় সমুদ্র তীরবর্তী জনগোষ্ঠী এসময়ে অন্তর্দেশীয় অঞ্চলে শুকনো মাঝের ব্যবসা করত।[১৪] এর থেকে এটা অনুমান করা খুব একটা অযৌক্তিক হবে না যে, হরপ্পাবাসী মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি কিছুটা রপ্ত করেছিল। আবার ওমানের রাস-আল্-জুনায়েদ এবং ইরাকের তেল-আসমার মত স্থানে হরপ্পার রপ্তানিকৃত হাতির দাঁতের তৈরি জিনিসপত্র[১৫] মিললেও অবাক হওয়ার কিছু নেই, বরং পশুর অর্থনৈতিক মূল্য সম্পর্কে হরপ্পাবাসী যে সচেতন ছিল তা এথেকে আরও স্পষ্ট হয়।

হরপ্পার সীলগুলিও নীরবে অনেক কথা দায়িত্ব নিখুঁত ভাবে পালন করেছে। মহেঞ্জোদাড়োর সীলে প্রচুর গলকম্বল শোভিত কুঁজ বিশিষ্ট ষাঁড়ে যে তেজী ও জীবন্ত ভাব ফুটে ওঠে বা গন্ডারের প্রতিকৃতি যুক্ত সীলে যে উঁচু গাঁট বিশিষ্ট কবচের মত শক্ত চামড়ার চিত্র দেখি তানিঃসন্দেহের শিল্পীর প্রত্যক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের দাবী রাখে।[১৬] বস্তুত ওই সমস্ত প্রাণীর গঠনতন্ত্র সম্পর্কে শিল্পীর সম্যক অভিজ্ঞতা ছিল বলে অনুমান করাও কষ্ট কল্পনা নয়। তবে মহেঞ্জোদাড়োতে বাঘ, গন্ডার, হাতি, মোষ এবং হরিণ পরিবৃত উপবিষ্ট যে যোগী মূর্তির সীল পাওয়া যায়, তার সঠিক পরিচয়ের কিনারা এখনো করা যায়নি। কিন্তু সে জাহাজের খোঁজে না গিয়েও একথা বলা যায়, সীলে উঠে আসা বন্য এবং গৃহপালিত প্রাণীগুলির সাথে হরপ্পাবাসীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভাব জড়িয়ে ছিল।

জীবজন্তু নিয়ে নাড়াচাড়া হরপ্পাবাসীর দৈনন্দিন জীবনের এমন এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল যে, তাদের কল্পনাবিলাসেও প্রাণীকুল নিজের জায়গা করে নিয়েছিল। তার নমুনা মেলে বিভিন্ন ফলকে নানাবিধ অদ্ভুত জীবজন্তুর চিত্র ফুটিয়ে তোলার মধ্যে দিয়ে; যেমন সিং যুক্ত বাঘ, তিন মাথা ষাঁড়।[১৭] শুধু তাই নয় মাটির তৈরি বিভিন্ন খেলনাও তারা গড়েছে পশুপাখির আদলে, যেমন কুকুর, গরু, মোষ ইত্যাদি। আশ্চর্যের বিষয় হল পুতুলগুলিকে বাস্তবসম্মত করতে তাদের মাথা যাতে নড়ে তার ব্যবস্থা করা হত।[১৮] অর্থাৎ বলা চলে কোন একমাত্রিক রূপে নয়, নানা আঙ্গিকে প্রাণিবিজ্ঞান চেতনা হরপ্পাবাসীর জীবনে সম্পৃক্ত হয়ছে।

## ৪

প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপটে, প্রাণিসম্পদ তথা প্রাণিবিজ্ঞান মনস্কতার বিকাশ ও বিবর্তনের ইতিহাসে বৈদিক যুগের অবদান বিশেষ আলোচনার দাবিদার। গরু ছিল সেখানে সবচেয়ে কাঙ্খিত এবং লুণ্ঠন যোগ্য সম্পদ। বস্তুত ব্যক্তির সম্পদ পরিমাপের একক ছিল গরু; তাই ঋক্‌বেদে ধনী ব্যক্তির সমর্থক শব্দ হল 'গোমৎ', গোসম্পদের অধিকারী। গোসম্পদ দখল করার জন্য আর্যদের মধ্যে আকছাড় যুদ্ধ লেগেই থাকত। তাই যুদ্ধের সমার্থক শব্দই হয়ে গিয়েছিল 'গবিষ্ট।[১৯] সহজেই বোঝা যায় গোসম্পদের কার্যকারিতা সম্পর্কে বৈদিক সমাজ যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল। আবার গরু চুরি আটকাতে গরুর কানে এঁকে দেওয়া হত সাংকেতিক চিহ্ন, যা কেবল গরু চুরিই আটকাতো না, বরং বিভিন্ন প্রজাতির গরুকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করত। ফলে প্রজননের সময় নির্দিষ্ট প্রজাতির গরুকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করত। ফলে প্রজননের সময় নির্দিষ্ট প্রজাতির গাভীর সঙ্গে উপযুক্ত ষাঁড়ের মিলন ঘটানো সম্ভব হত,[২০] যা উন্নত প্রজাতির গোসম্পদ সৃষ্টির জন্য আবশ্যিক। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ হল আর্যদের প্রাণিবিজ্ঞান মনষ্কতার অকাট্য প্রমাণ। অন্যদিকে আর্যদের ধর্মীয় আচরণের অন্যতম অঙ্গ পশুবলী হওয়া সত্ত্বেও ঋগ্‌বেদে গুগ্ধবতী গাভীকে 'অবধ্যা' চিহ্নিত করার বিষয়টিও চোখে পড়ার মত। এটি গরুর দুগ্ধ সংরক্ষণের সচেতন নির্দেশনা বলেই মনে হয়। তাই দেখা যায় ঋগ্‌বেদে রয়েছে গরুর দুধ বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বচ্ছ জল, বার্লি ও সবুজ ঘাস দেবার কথা (R.V.VI. 28.7.302)। অথর্ববেদও তথৈবচঃ! দেবী অরুন্ধতীর কাছে বন্ধ্যা গাভীকে দুগ্ধবতী করার জন্য প্রশস্ত চারণভূমি ও স্বচ্ছ জলের সরবরাহ বজায় রাখার প্রার্থনা করা হয়েছে (A.V.I.V.21.7.P.187)। অর্থাৎ দুগ্ধ বৃদ্ধির সঙ্গে পুষ্টিকর খাদ্যের

সরাসরি যোগাযোগ আর্যদের অজানা ছিল না।

আবার ঋগ্‌বেদে প্রায়শই দেখা গেছে ইন্দ্রের সৌজন্যে রাঁধা হয়েছে বলদের মাংস। বস্তুত বৈদিক দেবতাদের খাদ্য তালিকা বলীবর্দ, ছাগল, গরু, মোষের মাংস এবং দুধ, ঘি, মাখন, দইয়ে ভরপুর। শতপথ ব্রাহ্মণ দ্বিধাহীন ভাবে জানাচ্ছে মাংসই শ্রেষ্ঠ খাবার।[২১] শুধু দেবতা নয়, সাধারণ মানুষও উপনিষদের নিদান অনুযায়ী জ্ঞানী, দীর্ঘজীবী পুত্র সন্তান লাভের আশায় ভেড়া, গরু বা অন্যান্য প্রাণীর মাংস ঘি-ভাত সহযোগে খেতেন।[২২] অর্থাৎ দুধ থেকে বিভিন্ন উপজাত খাদ্যদ্রব্য তৈরির কৌশল যেমন তারা রপ্ত করেছিল, তেমনই প্রাণীজ খাদ্যের খাদ্যগুণ সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন ছিল বলেই মনে হয়। আবার ঋগ্‌বেদে গরুর রক্ত ও গোবরকে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির উপযুক্ত সার হিসাবে ব্যবহার[২৩] করার নির্দেশ থেকে বোঝা যায় গবাদি পশুর সামগ্রিক ব্যবহারিক মূল্য তারা জানত, যা প্রাণিবিজ্ঞান চর্চাকে নিঃসন্দেহে একধাপ এগিয়ে দিয়েছিল।

অন্য আরও একদিক দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় প্রাণিবিজ্ঞান চেতনা ও চর্চাকে বৈদিক যুগ মৌলিকতা দান করেছে; সেটি হল গৃহপালিত প্রাণীদের তালিকায় ঘোড়ার সংযোজন। ভগবানপুর, হস্তিনাপুর, অত্রঞ্জিখেরা, রোপার প্রভৃতি প্রত্নক্ষেত্রে গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, কচ্ছপ, মুরগি ইত্যাদির হাড়গোড়ের সাথে মিলেছে বৈদিক পর্বের ঘোড়ার কঙ্কালের সন্ধান।[২৪] ভারতের ইতিহাসে খ্রিষ্টপূর্ব পনেরশো-র আগো ঘোড়ার ব্যবহারের নিশ্চিত প্রমাণ নেই। অন্যদিকে বৈদিক সাহিত্যে ঘোড়ার উল্লেখের ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। ঋগ্‌বেদে সোমবেদের উদ্দেশ্যে করা প্রার্থনায় আর্যরা অনেক বেগবান ঘোড়া চেয়েছেন।[২৫] অর্থাৎ ঘোড়ার প্রচণ্ড গতি ও দৈহিক শক্তির গুরুত্ব আর্যরা আনুধাবন করেছে। বস্তুত ভ্রাম্যমাণ আর্যজাতির জীবনে ঘোড়া গতিময়তা এনে দিয়েছিল, যা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা জন্ম দিয়েছিল। প্রমাণ স্বরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা বলা যায়। এই যজ্ঞে একটি ঘোড়াকে ছেড়ে দেওয়া হত, সে যে সমস্ত ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে এগিয়ে যেত সেগুলি যজমানের অধীনস্ত অঞ্চল বলে ধরে নেওয়া হত। অর্থাৎ রাজশক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে ঘোড়া। তাই ঘোড়ার যত্ন আত্তিতেও কোন অভাব রাখেনি আর্যরা। ঋগ্‌বেদে ঘোড়ার শারীরিক সুস্থতা এবং রুগ্ন ঘোড়ার রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। আবার যজুর্বেদে ঘোড়ার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য শুষ্ক শষ্য খেতে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।[২৬] বস্তুত বৈদিক পর্বে ব্যক্তি বিশেষ এবং সমাজ উভয়েই বারবার গরু, ঘোড়া ইত্যাদি প্রাণীদের সম্পদ রূপে বিবেচনা করার মত যথেষ্ট পরিণত প্রাণিবিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয় দিয়েছে, যা ভারতীয় প্রাণিবিজ্ঞান চর্চার বিবর্তনকে নিজস্বতা প্রদান করেছে।

অন্যদিকে আর্যদের ধর্মীয় আচরণের অন্যতম অঙ্গ বলিদান হওয়ায় প্রাণীদের দৈহিক গঠনতন্ত্র জানাটা সহজ হয়েছিল।[২৭] তাই তৈতেরিয় সংহিতায় প্রাণিজগতকে মেরুদন্ডী ও অমেরুদন্ডী এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আবার অথর্ববেদে একটি ষাঁড়ের পঞ্চাশটি এবং একটি ঘোড়ার আশিটি শরীরস্থানের উল্লেখ করা হয়েছে।[২৮] অর্থাৎ আর্যরা অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাণীদের শরীরের ভিতরকার কলাকৌশলও বেশ ভাল রকমই জেনে নিয়েছিল। শুধু তাই নয়, তারা তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগও করেছে বারবার। মহাকাব্যিক মহাভারতে পঞ্চপান্ডবের মধ্যে নকুল এবং সহদেবকে প্রাণী চিকিৎসক হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে নকুল অশ্ব পরিচালন, প্রশিক্ষণ এবং চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন করেছে। অন্যদিকে সহদেব ছিলেন গোবিশেষজ্ঞ। তবে মহাভারতে প্রাণী

চিকিৎসাবিজ্ঞানে সর্বজ্ঞ হিসাবে ঋষি শালিহোত্রের কথা বলা হয়েছে -

"Salihotro'th kim nu syad dhayanam kulattvavit |
manusam samanuprapto vapuh paramasobhanam ||[২৯]

Mbh. 3.69.25

বস্তুত ঋষি শালিহোত্র ভারতীয় প্রাণী চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক রূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ঘোড়ার চিকিৎসার উপর লেখা 'অশ্বশাস্ত্র' বা 'হয় আয়ুর্বেদ' তাঁর নাম অনুসারে 'শালিহোত্র সংহিতা' নামে পরিচিত। গবেষিকা মনিকা মিডোস দেখিয়েছেন বৈদিক ঋষি শালিহোত্রের শিষ্যদের মাধ্যমে কালপরম্পরায় 'শালিহোত্র সংহিতা' মৌখিক ও লিখিত আকারে সঞ্চালিত হয়েছে।[৩০] ৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত শালিহোত্র সংহিতার ১৮০০টি শ্লোকে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির ঘোড়ার নানা লক্ষণ, তাদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, খাদ্য তালিকা থেকে শুরু করে ঘোড়ার নানবিধ রোগ নির্ণয় ও তা নিরাময় এবং রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে যাবতীয় খুঁটিনাটির বিবরণ ও বিশ্লেষণ। বস্তুত ভারতীয় প্রাণিবিজ্ঞানের ইতিহাস ঘাটতে বসলে দেখা যায়, সেখানে পরতে পরতে লুকিয়ে রয়েছে চমকের সম্ভার। শালিহোত্র সংহিতায় ঘোড়ার চক্ষুরোগ, জিভ ও মুখে ঘা, চামড়ার রোগ, পেট খারাপ, হাড়ভাঙা এমনকি জননাঙ্গের নানা রোগ ও প্রসবকালীন সমস্যা ইত্যাদি প্রতিকারের নির্বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে,[৩১] যা সমকালীন প্রাণী চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎকর্ষের স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি। আবার প্রাচীন ভারতে ঘোড়ার চিকিৎসার উপর লেখা আরেকটি তাৎপর্যূর্ণ বই হল 'অশ্বচিকিৎসা', যার লেখক হিসাবে ঋষি শালিহোত্রের অন্যতম শিষ্য নকুলের নাম পাওয়া যায়। তবে এই নকুল পঞ্চপান্ডবের নতুল , না তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে তা জানা নেই।[৩২] অবশ্য এসব সাত সতেরোর জন্য বইটির গুণগত মানকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। কারণ বইটি ঘোড়ার দাঁত, রঙ, গতি, শরীরের বিভিন্ন অংশের পরিমাপ, উপযুক্ত আস্তাবল নির্মাণ এবং প্রশিক্ষণ পদ্ধতির বিশদ বিবরণের পাশাপাশি ঘোড়ার বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের উপায় সম্পর্কেও হদিশ দেয়।[৩৩] তাই প্রাচীন ভারতীয় প্রাণিবিজ্ঞান চর্চার অন্য একটি নিখাদ প্রমাণ হল এই বইটি।

৫

দিনে দিনে কৃষি ক্ষেত্রে, যুদ্ধে বা শান্তিতে তথা দৈনন্দিন জীবনে পশুপাখির ব্যবহারিক গুরুত্ব মানুষ যত বেশি করে টের পেয়েছে সমাজ ততবেশি করে প্রাণী সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভভ করেছে। তাই সমাজের অনিবার্য চাহিদা থেকেই খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পশুবলি সর্বস্ব বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রতিবা হিসাবে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম উঠে এসেছে। সেখানে অহিংসার যে যুগান্তকারী সুর বেজেছে তা প্রাণী সংরক্ষণের অন্যতম ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে প্রাণিবিজ্ঞান চেতনা ও চর্চার ধারা আরও একবার নতুন খাতে বইবার সুযোগ পেয়ে চনমনে হয়ে উঠেছে। পালি অনুশাসনে অহিংসার বিষয়ে মানুষের চেয়ে পশুর উপর বেশি নজর দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধদেব অযথা পশুবলি বন্ধ করার পাশাপাশি পশুদের প্রতি করুণার মনোভাবকে উৎসাহ দিয়েছেন। সুত্তনিপাতে বলা হয়েছে গরু আমাদের খাদ্য, সৌন্দর্য ও সুখদান করে, তাই তাকে রক্ষা করা উচিত। জাতকের কাহিনীতেও বুদ্ধদেব বারবার বিভিন্ন প্রাণীর চরিত্রে বোধিসত্ত্ব রূপে ফিরে এসে পশুদের প্রতি নৈতিক মূল্যবোধ, ভালবাসা, অহিংসা এবং করুণার পাঠ দিয়েছেন। চোখের আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন মানুষের মত প্রাণীদেরও প্রাণ আছে, রয়েছে আবেগ, সন্তানের প্রতি স্নেহ ও দায়িত্ববোধ, তাদেরও আঘাত পেলে যন্ত্রণা হয়, তারাও মৃত্যুর ভয় পায়।[৩৪] আসলে পশুর ওপর মনুষ্যত্ব আরোপ করে বুদ্ধদেব মানুষের মানবিকতাকেই উস্কে দিয়েছেন, যা প্রাণিবিজ্ঞান চেতনা ও চর্চার বিকাশকে প্রেরণা যুগিয়েছে।

বুদ্ধদেব মজ্‌ঝিম পন্থার সন্ধান দেন। তিনি কখনই মানবিকতাকে নিয়ম হিসাবে জোর করে চাপিয়ে দেননি বরং নৈতিক আদর্শকে ডাক দিয়েছেন। তাই মাছ, মাংস খাওয়া তিনি নিষিদ্ধ করেননি! তবে জীবকে সূত্রে বুদ্ধদেব শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, কোন প্রাণীকে দেখে বা শুনে অথবা এটা জেনে যে, বিশেষ ভাবে তাঁকে মাংস খেতে দেওয়ার জন্যই কোন প্রাণীকে হত্যা করা হয়েছে তবে সেই মাংস খাওয়া চলবে না।[৩৫] অর্থাৎ বেপরোয় মাংস খাওয়ার লোভকে সংযম দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার উপায় সন্ধান করেছেন বুদ্ধদেব। আবার বিনয় পিটকে হাতি, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, চিতা, ভল্লুক, লেপার্ড এবং সাপের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৩৬] বলার অপেক্ষা রাখে না প্রকৃতির ভারসাম্য বজায়

রাখতে বন্য প্রাণীকে সংরক্ষণ করার এই সচেতন পদক্ষেপ প্রাণিবিজ্ঞান সচেতনতার মোক্ষম প্রমাণ। অন্যদিকে জৈন ধর্মে তীর্থঙ্করদের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে ষাঁড়, মোষ, ছাগল, ঘোড়া থেকে শুরু করে বক, সাপ, সিংহ ইত্যাদি প্রাণীর উপস্থাপনাও জীববৈচিত্র্যকে সুরক্ষিত রাখারই হার্দিক প্রচেষ্টার ছবিটি তুলে ধরে। আবার মহান চিকিৎসক বা 'মহাবিশাখ' হিসাবে পরিচিত বুদ্ধদেব সাপের বিষের প্রতিষেধক হিসাবে এবং জণ্ডিস নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিনয় পিটকের অন্তর্গত মহাভাগ্যায় গোমূত্র ব্যবহারের বিধান দেন।[৩৭] শুধু তাই নয় আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় দুধ, ঘি, মাখন ইত্যাদি দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারের প্রমাণ রয়েছে বৌদ্ধ সাহিত্যে, যা প্রাণী সম্পদের গুরুত্ব বোধ সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দেয়।

৬

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অহিংসার বাণী যেভাবে প্রাণী সংরক্ষণ ও প্রাণিবিজ্ঞানের বিকাশে সহায়ক হয়েছিল তার সরাসরি প্রভাব পড়েছিল কৃষিক্ষেত্রে। ফলে পশুশক্তি নির্ভর কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল, যা শক্তিশালী রাজ্য গঠনের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। বৌদ্ধ অঙ্গুত্তরনিকায় এবং জৈন ভগবতীসূত্র থেকে জানা যায়, ঠিক ঐ সময়ে ষোলটি মহাজনপদের উত্থান ঘটেছিল। আবার তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মহাজনপদ হিসাবে মগধের উত্থানের পেছনেও রয়েছে সেই প্রাণীকুলের সৌজন্য। মগধের সামরিক শক্তির একটি মোক্ষম উৎস ছিল প্রশিক্ষিত হস্তিবাহিনী।[৩৮] বারহুতের স্তুপে রয়েছে হাতির পিঠে চেপে অজাতশত্রুর বুদ্ধদেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার দৃশ্য।[৩৯] অন্যদিকে গ্রিক ঐতিহাসিক সূত্রেও বারবার উঠে এসেছে মগধের বিরাট হস্তিবাহিনীর খবর। কুটিয়াসের বিবরণ অনুযায়ী মগধরাজ ধনন্দের কমপক্ষে তিন হাজার হাতি ছিল। অবশ্য অন্যান্য গ্রিক লেখকদের মতে, হাতির সংখ্যাটি ছিল চার থেকে ছয় হাজার। ডায়োডোরাস দেখিয়েছেন, নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চল যে বহিঃশত্রুরা কখনও জয় করতে পারেনি তার একমাত্র কারণ হল বিরাট হস্তিবাহিনীর দুর্দান্ত দাপট। তাই সংগত কারণেই মনে করা হয় গ্রিক বীর আলোকজান্ডারের সেনাবাহিনী ধননন্দের বিশাল হস্তিবাহিনীর ভয়েই বিপাশা পেরিয়ে আর এগোনোর সাহস করেনি।[৪০] বলাই বাহুল্য হাতিকে এভাবে সামরিক শক্তির মেরুদন্ড হিসাবে ব্যবহার করা, প্রাণিবিজ্ঞান চেতনা ও চর্চাকে বাদ দিয়ে অসম্ভব।

৭

মৌর্য যুগে প্রাণিবিজ্ঞান চর্চা সরকারী আনুকূল্য পায়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' থেকে জানা যায়, গবাদি পশু, হাতি, ঘোড়া দেখভালের জন্য মৌর্য রাষ্ট্র, আলাদা আলাদা অধ্যক্ষ নিয়োগ করেছিল। এমনকি কষাইখানার জন্যও ছিল সরকারি আধিকারিক। কৌটিল্যের কড়া আদেশ দুগ্ধবতী গাভী, বাছুর, ষাঁড়ের মাংস বিক্রি করলে পঞ্চাশ পনা জরিমানা হবে।[৪১] শুধু গৃহপালিত পশু নয়, রাষ্ট্রীয় সুরক্ষাধীনে থাকা হরিণ, বাইসন, ময়ূর ইত্যাদি বন্য পশুপাখিকে আঘাত করলেও রাষ্ট্র কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নেবে বলে অর্থশাস্ত্র হুশিয়ার করেছে। অন্যদিকে কষাইখানায় বিকলাঙ্গ, কূট গন্ধযুক্ত বা আগেই মরে যাওয়ার প্রাণীর মাংস বিক্রি করা নিষিদ্ধ; অন্যথায় বারো পনা জরিমানা গুণতে হবে।[৪২] বর্তমানের ভাগাড় কান্ডের নিরিখে , কষাইখানা সম্পর্কে কৌটিল্যের এহেন দৃষ্টি থেকে একথা বলাই যায়, প্রাণিবিজ্ঞান সচেতন মৌর্য রাষ্ট্র প্রাণী সুরক্ষা ও জনকল্যাণকে এক সুতোয় বাঁধার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল।

অর্থশাস্ত্রে গোঅধ্যক্ষের দায়িত্বের সূচিপত্র দেখলেই মৌর্য সমাজে গোসম্পদের মূল্য সম্পর্কে সেচতনার পরিধির বিস্তৃতি বেশ অনুধাবন করা যায়। গবাদি প্রাণীর জন্ম, মৃত্যু, অসুস্থতা ও নিখোঁজ হওয়ার হিসাবের সাথে সাথে দুধ, ঘি, অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনের সামগ্রিক হিসাব রাখতেন গোঅধ্যক্ষ।[৪৩] শুধু তাই নয় গরু, মহিষের কানে, ভেড়া, ছাগল এবং গাধার চামড়ায় রাষ্ট্রীয় সাংকেতিক চিহ্ন এঁকে দেওয়া হত, যার দ্বারা প্রজননে সক্ষম গবাদি পশুদের বেছে নেওয়া সম্ভব হত। তাই হিসাব করে ১০টি গরু বা মোষ পিছু ৪টি করে ষাঁড় এবং ১০০টি ছাগী বা ভেড়ী পিছু ১০টি করে পাঠা রাখা সম্ভব হত।[৪৪] স্বীকার করতেই হয়, এই অনুপাত প্রাণী প্রজননবিদ্যা সম্পর্কে মৌর্য আমলের তীক্ষ্ম

জ্ঞানের পরিচয় দেয়। মরশুম ভেদে গরু দোয়ানোর রকমফেরও বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। বর্ষায়, শরৎকালেও শীতের শুরুতে সকাল-সন্ধ্যায় দুবার করে আর শীতের শেষে দিকে, বসন্ত আর গরমকালে কেবল সকালবেলা গরু দোয়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশের সাথে বর্ষা ও শীতের শুরুতে চারণভূমিতে সবুজ ঘাস তথা ঘোখাদ্যের প্রাচুর্য এবং অন্যদিকে গরমের দাপটে তৃণভূমি শুকিয়ে যাওয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক খোঁজা যেতেই পারে।[৪৫] তবে রাষ্ট্র কেবল কাজের নির্দেশ দিয়েই দায় সারেনি; অনিয়মে কড়া শাস্তিরও ব্যবস্থা করছে। তাই অর্থশাস্ত্রের কড়া হুকুম একবারের বদলে দু'বার দুধ দোয়ানো হলে শাস্তি স্বরূপ গোয়ালার হাতের বুড়ো আঙুল কেটে দেওয়া হবে![৪৬] সহজেই বোঝা যায়, অতিরিক্ত পরিমাণ দুধ দুয়িয়ে নিলে বাছুরের প্রাপ্য খাদ্যে টান পড়বে এবং গাভীর শরীরের পক্ষেও তা কুপ্রভাব ফেলবে, একথা জানা ছিল বলেই এই সতর্কতা অবলম্বন। অর্থশাস্ত্রে আরও বলা হয়েছে একদ্রোণ গরুর দুধ থেকে এক প্রস্থ মাখন পাওয়া যাবে, তবে সমপরিমাণ ছাগলের দুধে মাখন হবে ১/২ ভাগ বেশি, আর সমপরিমাণ মোষের দুধের বেলায় হবে ১/৫ ভাগ বেশি। আসলে ততদিনে কত দুধে কতটুকু মাখন পাওয়া যাবে, তা যেমন জানা হয়ে গেছে তেমনই গরু, মোষ এবং ছাগলের দুধের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কেও জ্ঞান হয়েছে যথেষ্ট।[৪৭]

আবার অর্থশাস্ত্রে গবাদি পশুর জন্য বরাদ্দ খাদ্যের যে অভিজ্ঞ পরিমাপ বোধের পরিচয় রয়েছে, তা নিঃসন্দেহে সে আমলের প্রাণিবিজ্ঞান চর্চার জাত চেনায়। খাদ্যের উপকরণকে এক রেখে ভিন্ন ভিন্ন গবাদি পশুর সাপেক্ষে বারবার পরিমাণকে পাল্টে দেওয়া হয়েছে। মালবাহী বলদকে অর্ধেক ভার সবুজ ঘাশ, দু'গুণ দূর্বা ঘাস, এক তুলা তৈল বীজ, এক দ্রোণ দুধ, এক আধাকা দই, এক দ্রোণ বার্লি, পাঁচ পলা নুন, এক তুলা মাংস, অর্ধেক আধাকা সুরা, দশ পলা চিনি সহযোগে বলবর্ধক খাবার দিতে হবে। কিন্তু গরু, খচ্চর এবং গাধার ক্ষেত্রে ঐ বরাদ্দের পরিমাপ ছিল তিন ভাগের এক ভাগ; মোষ এবং উঠের বেলায় বেড়ে হত দ্বিগুণ।[৪৮]

অন্যদিকে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে ঘোড়ার পরিচর্চাতেও রয়েছে প্রাণিবিজ্ঞান সম্মত মুন্সিয়ানার ছাপ। ঘোড়ার অধ্যক্ষ মোট ঘোড়ার সংখ্যা, তাদের প্রজাতি, বয়স, রং, দৈহিক চিহ্ন ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নথিভুক্ত করে রাখতেন। অবাক হতে হয় ঘোড়ার দৈহিক গঠন অনুসারে উত্তম, মধ্যম ও সাধারণ ঘোড়া চিহ্নিত করার কৌশল দেখে। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে, উত্তম ঘোড়ার মুখের পরিমাপ হবে ৩২ আঙুল, দৈর্ঘ্য হবে মুখাবয়বের ৫ গুণ বড়, জঙ্ঘার পরিমাপ হবে ২০ আঙুল, আর উচ্চতা হবে জঙ্ঘার চার গুণ বেশি। এই পরিমাপ থেকে মাত্র দু'আঙুল কম হলেই সে ঘোড়া হবে মধ্যম মানের, আর যদি মাপে তিন আঙুল কম পড়ে, তাহলে সে ঘোড়া সাধারণ![৪৯] এই তিন ধরণের ঘোড়াকে আবার প্রয়োজন মাফিক আলাদা পরিমাণ খাবার দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। উত্তম ঘোড়ার জন্য দুই দ্রোণ পরিমাণ চাল অথবা বার্লি সেদ্ধ করে তার সাথে এক প্রস্ত তেল, পাঁচ পলা নুন, পঞ্চাস পলা মাংস, দুই আধকা দই, পাঁচ পলা চিনি মিশিয়ে খাবার দেওয়ার কথা রয়েছে। ক্রমানুযায়ী মধ্যম ও সাধারণ ঘোড়ার বেলায় ঐ পরিমাপগুলি ১/৩ ভাগ করে কমিয়ে দেওয়ার বিধান রয়েছে।[৫০] আবার সদ্য প্রসবিনী ঘোটকি ও তার শাবকের খাবারের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। অর্থশাস্ত্রে প্রথম তিনদিন মা ঘোড়াকে বলবৃদ্ধির জন্য একপ্রস্থ বার্লির সাথে সমপরিমাণ ঘি খাওয়ানোর নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। অন্যদিকে শাবকের বয়স দশ দিন পেরলেই ছয়মাস পর্যন্ত তাকে এক কুড়ুবা বার্লির সাথে এক - তৃতীয়াংশ ঘি এবং এক প্রস্থ দুধ খায়ানো হত। এখানেই শেষ নয়! ছয় মাসের পর শাবকটিকে এক প্রস্থ করে বার্লি দেওয়া হবে, যা প্রতিমাসে ৰাপ প্রস্থ করে বাড়ানো হবে; একেবারে তিন বছর পর্যন্ত! চার থেকে পাঁচ বছর বয়সে যখন শাবকটি কাজের উপযুক্ত হয়ে উঠবে তখন ঐ খাবার দাঁড়াবে এক দ্রোণ পরিমাণে।[৫১] বলার অপেক্ষা রাখে না, মৌর্যরাষ্ট্র যে সেই খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকেই প্রাণী প্রতিপালনে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের অধিকারী ছিল, তার প্রায়োগিক রূপের যথার্থ পরিচয় রয়েছে পোষ্য প্রাণীদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য নির্বাচনের দক্ষতায় এবং সূক্ষ্ম পরিমাপ বোধ।

যুদ্ধ ঘোড়ার কার্যকারিতা সম্পর্কে ভারতীয় সমাজের অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই হয়েছে। ফলে মৌর্য রাষ্ট্রযন্ত্রের ঘোড়ার বিষয়ে তৎপরতার আসল কারণটা যে যুদ্ধে ঘোড়াকে কাজে লাগানো, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। অর্থশাস্ত্রে ঘোড়াকে যুদ্ধে পারদর্শী করে তুলতে প্রত্যহ প্রশিক্ষণের নির্দেশ রয়েছে। অশ্বচালনার জন্য উপযুক্ত ঘোড়ার বৈশিষ্ট্য হিসাবে অর্থশাস্ত্র দ্রুত গতিতে ছোটা, ফূর্তিতে লাফানো, স্বচ্ছন্দে হাঁটা এবং প্রদত্ত ঈশারায় সঠিক প্রতিক্রিয়া করার প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করেছে।[৫২] শুধু তাই নয় ঘোড়ার চিকিৎসার নিয়োগ করেছে মৌর্যরাষ্ট্র। চিকিৎসায় গাফিলতি বা ভুল চিকিৎসায় রাষ্ট্র উপযুক্ত শাস্তিরও ব্যবস্থা করেছে,[৫৩] যা প্রাণিবিজ্ঞান সচেতন মৌর্যরাষ্ট্রের দায়িত্ব বোধকেই প্রতিভাত করে।

মৌর্যরাষ্ট্রে হাতি যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী সম্পদ ছিল, অর্থশাস্ত্রে হাতির পুরোদস্তুর খেয়াল রাখার মধ্যে দিয়েই তা বোঝা যায়। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে হাতির প্রতিপালন, পরিচালন ও প্রশিক্ষণের তদারকি করতেন হস্তি অধ্যক্ষ। গ্রিক সূত্র অনুযায়ী চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নয় হাজার হাতি ছিল। কৌটিল্যের মতে চল্লিশ বছরের, সাত আরাতনিস উচ্চতা, নয় আরাতনিস দৈর্ঘ্য ও দশ আরাতনিস বেড় বিশিষ্ট হাতি হল সেরা হাতি।[৫৪] আসলে উপযুক্ত বয়স এবং সঠিক গঠনতন্ত্রই যে হাতির কার্যকারিতার মাপকাঠি, প্রাণী বিজ্ঞানমনস্ক মৌর্যরাষ্ট্রের ততদিনে তা বোঝা সাড়া। আবার যখন সেরা হাতির খাদ্য নির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে, অর্থশাস্ত্র তার উত্তরে এক দ্রোণ চাল, তিন প্রস্থ ঘি, দশ পলা নুন, পঞ্চাস পলা মাংস, দুই আধাকা দই, দুই আধাকা দুধ, দুই ভার সবুজ ঘাস, দশ পলা চিনি এবং বিভিন্ন গাছের কচি ডালাপালা দেবার নিদান দেয়।[৫৫] কাজের নিরিখে হাতিকে চার ভাগে ভাগ করেছে অর্থশাস্ত্র; প্রশিক্ষণাধীন, যুদ্ধের উপযুক্ত, সাধারণ যাতায়াতে ব্যবহৃত এবং প্রশিক্ষণের অযোগ্য হাতি। এদের মধ্যে যুদ্ধে ব্যবহৃত হাতির জন্য অর্থশাস্ত্র কুচকাওয়াজ, দুর্বার বাবে দল বেঁধে এগিয়ে যাওয়া, অন্য হাতির সাথে যুদ্ধ, দূর্গের দরজা গুঁড়িয়ে দেওয়া, শত্রুকে পদদলিত করে নিকেশ করা এবং প্রযোজনে অপসারণ করার প্রশিক্ষণকে বাধ্যতামূলক করেছে।[৫৬] গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস, মৌর্য আমলের হাতির চিকিৎসা পদ্ধতির এক চিত্রাকর্ষক বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, হালকা ক্ষত ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে ধুয়ে মাখন লাগানো হত, কিন্তু গভীর ক্ষতের চিকিৎসা ছিল অন্য; সেক্ষেত্রে ক্ষতের মধ্যে শূকরের তাজা রক্তাক্ত মাংস পুরে দেওয়া হত। শুধু তাই নয়, হাতির চোখের রোগ সারাতে গুরুর দুধ গরম করে সেক দেওয়ার চল ছিল বলে মেগাস্থিনিস জানান।[৫৭] কাজেই দুটি ভিন্ন প্রাণীর দেহজ উপাদানের সমন্বয়ে যে ক্ষত নিরাময় করা বা রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হতে পারে, তা এযুগে জানা ছিল। তাই বলা যায়, প্রাণিবিজ্ঞান চেতনা ও চর্চার প্রতিটি ক্ষেত্র দিয়ে মৌর্য আমল স্বচ্ছন্দে এগিয়েছে।

মৌর্য সম্রাট অশোকের শিলালেখগুলোর দ্বারস্থ হলেও অনায়াসেই সে আমলের প্রাণিবিজ্ঞান চর্চার সার্বিক বিকাশের ছবিটি ফুটে ওঠে। অশোক তাঁর পয়লা নং শিলালেখেই পশুবলি ও অযথা প্রাণী হত্যা খারিজ করছেন। এমনকি রাজকীয় রান্না ঘরেও মাংসের জন্য শুধুমাত্র দুটো ময়ূর ও একটি হরিণ বরাদ্দ হয়েছে যা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন।[৫৮] এইভাবে অশোক প্রাণী সংরক্ষণের কাজ নিজের রান্নাঘর থেকে শুরু করেছেন। আবার দ্বিতীয় মুখ্য শিলালেখ অনুযায়ী অশোক নিজের সাম্রাজের পাশাপাশি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এমনকি দূরবর্তী মিত্র গ্রিকরাজ অ্যান্টিওকাস ও তাঁর প্রতিবেশি রাজ্যগুলিতেও মানুষের পাশাপাশি পশু-পাখিরও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। চিকিৎসা মানেই ডাক্তার, ঔষুধ এবং ডাক্তারখানা! তাই পশুর চিকিৎসার জন্য পশুচিকিৎসক থাকবেন, তা মনে করাই যেতে পারে। অনুমানটা একেবারে অহেতুক নয়, কারণ দ্বিতীয় মুখ্য শিলালেখে অশোক এও বলেছেন যেসব জায়গায় মানুষ ও পশুর চিকিৎসার উপযুক্ত বিভিন্ন ঔষধি গাছপালা পাওয়া যায় না, সেখানে সেগুলি অন্য জায়গা থেকে আনিয়ে লাগানো হয়েছে।[৫৯] এই ভাবে অশোক মানুষের সাথে সাথে প্রাণীদেরও চিকিৎসার অধিকার দিয়েছেন। তাই ঐ একই

শিলালেখে যখন অশোক বলেন রাস্তার ধারে পথচারী মানুষ ও পশুপাখির জল তেষ্টা মেটাতে কুয়ো খোঁড়া হয়েছে এবং ছায়া যোগাতে গাছ লাগানো হয়েছে, তখন আরও একবা প্রাচীন ভারতের প্রাণিবিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতি বিস্ময় জাগায়। অন্যদিকে পঞ্চম স্তম্ভলেখে গর্ভবতী ছাগী, ভেড়ী ও দু'মাসের কম বয়সী শাবককে হত্যা করা নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি টিয়া, ময়না, পায়রা, কচ্ছপ, গন্ডার, হরিণ ইত্যাদি বন্য প্রাণী হত্যাও নিষিদ্ধ করেন।[৬০] অশোকের এই পদক্ষেপ অবশ্যই সমকালীন জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্রকে সুরক্ষা প্রদান করে এবং একইসাথে অশোকের প্রাণিবিজ্ঞান সচেতনতার পক্ষে কথা বলে। তবে মৎস্য শিকার সম্পর্কে অশোক নভেম্বর মাস পর্যন্ত যে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন, তা প্রাণিবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর সম্মক জ্ঞানের আবেদনকে আরও জোরদার করে। ভারতবর্ষে মাছেদের প্রজননকাল মোটামুটি জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ঐ সময় সদ্য প্রসবিনী মাছ দুর্বল থাকে, অশোক তাঁর নির্দেশ দ্বারা ঐ সময় তাদের নিরাপত্তার সংস্থান করেছেন।[৬১]

মৌর্য আমলের প্রাণিবিজ্ঞান মনস্কতার বহিঃ প্রকাশের আর একটি আঙ্গিক হল অশোকের শিল্পকলা। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা অশোক স্তম্ভগুলির শিখরে সিংহ (লৌরিয়নন্দনগড়, সারনাথ), হাতি (সঙ্কাশ), ঘোড়া (লুম্বিনী), ষাঁড় (রামপূর্বা) ইত্যাদি বিভিন্ন পশুপাখির প্রতিকৃতি জায়গা করে নিয়েছে। আধুনিক ভারতের জাতীয় প্রতীক সারনাথের অশোক স্তম্ভে পিঠে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো চারটি সিংহের পেশিসমৃদ্ধ দেহ সৌষ্ঠব, চওড়া কাঁধ, ফুলে ওঠা কেশর, বিস্ফারিত চোখ, ব্যাদিত মুখ, তীক্ষ্ম নখ সার্থকভাবে পশুরাজ সিংহের দৈহিক বল ও দৃঢ়তাকে ফুটিয়ে তোলে।[৬২] অন্যদিকে রামপূর্বায় উঁচু কুঁজ ও গলকম্বল শোভিত বৃষমূর্তির বলিষ্ঠ অবয়ব বা ধৌলির পর্বতগাত্রে খোদিত হাতির প্রলম্বিত শুঁড়, অলস ভঙ্গিতে গমনের যে ভাব উঠে আসে তা এক কথায় অনবদ্য। বস্তুত পাথর কেটে প্রাণীদের এহেন বাস্তবসম্মত অবিকল প্রতিকৃতি নির্মাণ প্রাণীর শরীর সংস্থান সম্পর্কে চুলচেরা ধারণার দাবী রাখে। আর অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় শিল্পকলায় বারবার বিভিন্ন প্রাণীর উপস্থাপনা প্রমাণ করে মৌর্য প্রশাসন প্রাণী সংরক্ষণকে তাদের জাতীয় নীতির অন্তর্ভুক্ত করেছিল, যা নিঃসন্দেহে প্রাণিবিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহ দেয়। ফলে একথা বলতে কোন আপত্তি থাকে না, প্রাচীন ভারতে প্রাণিবিজ্ঞান চেতনা ও চর্চার যে ধারা বহমান ছিল, সম্রাট অশোকের আমলে তা আরও পুষ্ট হয়।

৮

মনুর হাত ধরে প্রাচীন ভারতীয় প্রাণিবিজ্ঞান চর্চা আর এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে। মনুর বিধান কখনও নৈতিকতা, কখনও দায়িত্ব বোধের মাধ্যমে প্রাণী সংরক্ষণ ও জীবনৈচিত্র্যের গুরুত্বকে সমকালীন জনচেতনা এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করে। মনু হাতি, ঘোড়া, গাধা, উঠ, হরিণ, ছাগল, ভেড়া, মাছ, সাপ ইত্যাদি প্রাণী হত্যাকে 'পাপ' বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৩] বুঝতে অসুবিধা হয় না, অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ 'পাপবোধ' কে মনু জীববৈচিত্র বজায় রাখার কার্যকারী দাওয়াই হিসাবে কাজে লাগিয়েছেন। অবশ্য শুধুমাত্র জনগণের নৈতিক বোধের উপর ভরসা রেখেই মনু থেমে যান নি, বরং প্রাণী সুরক্ষা রাজার আবশ্যিক কর্তব্য বলে বিধান দিয়েছেন। তাই মনুর সাবধান বাণী হল, গরু, হাতি, ঘোড়া, উট ইত্যাদি প্রাণী হত্যা করলে রাষ্ট্র পাঁচশত পনা জরিমানা ধার্য করবে।[৬৪] বন্য প্রাণীদের জন্যও মনু সমানভাবে চিন্তিত, তাই মনুর কড়া নির্দেশ বন্য পশু পাখি কোন বাবে বিক্রয় করা যাবে না। অন্যথায় রাষ্ট্র উপযুক্ত শাস্তি দেবে। বস্তুত প্রাণী সুরক্ষায় রাষ্ট্রের এরূপ তৎপরতা প্রাণিবিজ্ঞান মনস্ক রাষ্ট্রের জন্য আবশ্যিক। আবার মানুষের ভোজন যোগ্য খাদ্যের যে তালিকা মনু প্রদান করেন তাতেও রয়েছে প্রাণিবিজ্ঞান সচেতনতার পরিচয়। মনু ভোজন যোগ্য খাদ্যগুলিকে উদ্ভিদ ও উদ্ভিজ এবং প্রাণী ও প্রাণীজ উপাদানে বিভক্ত করেছেন। তবে প্রাণীজ ভোজন যোগ্য খাদ্য অপেক্ষা ভোজন অযোগ্য প্রাণীজ খাদ্যের কথা বেশি বলেছেন। রুই, মাগুর জাতীয় কিছু মাছ ছাড়া বেশির ভাগ মাছকেই খাদ্য তালিকায় রাখেননি।[৬৫] কারণ বেশির ভাগ মাছ অন্যান্য প্রাণীর মৃত দেহ খায়, ফলত ঐ সব

মাছ খেলে মানুষের শরীরে বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। অন্যদিকে এর দ্বারা ব্যাপক পরিমাণে মৎস্য শিকার বন্ধ করা সম্ভব হবে, যা জীববৈচিত্রকে সুরক্ষিত রাখবে। আবার ঘি, দুধ, দই তথা দুগ্ধ জাত দ্রব্যাদিকে প্রত্যহ খাদ্য তালিকায় রাখা হয়েছে।[৬৬] ফলে গোসম্পদ বিকাশ বিকাশের সুযোগ ত্বরান্বিত হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। বস্তুত প্রাণীকুলের মৌলিক কার্যকারিতা ও গুরুত্বকে মাথায় রেখে মনু যে বিধান দিয়েছেন, তা প্রাচীন ভারতীয় প্রাণিবিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতির ক্ষেত্রে সংবিধান স্বরূপ।

৯

চরক ও সুশ্রুত এই দুই আয়ুর্বেদ সংহিতা মানুষের পাশাপাশি পশু-পাখির চিকিৎসার সম্পর্কেও বিস্তার ও অনুপুঙ্খ গবেষণার নজির রাখে। বস্তুত প্রাচীন ভারতীয় প্রাণিবিজ্ঞান চর্চার অন্যতম দুই দলিল হল চরক ও সুশ্রুত সংহিতা। চরক সংহিতা খাদ্যাভ্যাস ও বাসস্থানের নিরিখে প্রাণিদের আট ভাগে ভাগ করে প্রসহ (বাঘ, চিল), ভূমিশয় (ইদুঁর, বেজি), আনুপ ( হাতি, মোষ), জাঙ্গল (হরিণ), জলজ (মাছ, কচ্ছপ), চলচর (পানকৌড়ি সারস), বিস্কির (তিতির), প্রতুদ (পায়রা, কোকিল)।[৬৭] অন্যদিকে সুশ্রুত সংহিতায় কীটপতঙ্গ, কৃমি, সাপ ইত্যাদির কথাও বলা হয়েছে। জোঁকের বারো রকমের প্রকারভেদ এবং তাদের জীবনচক্র বিশদে আলোচনা করেছেন সুশ্রুত।[৬৮] প্রাণীদের এইরূপ নিখুঁত শ্রেণিকরণ প্রাণী চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। চরক সংহিতায় প্রাণী চিকিৎসার জন্য ভেষজ ঔষধির উল্লেখ রয়েছে। সুশ্রুত সংহিতায় রয়েছে প্রাণী শল্য চিকিৎসা পদ্ধতির কথা। শল্য চিকিৎসায় ছয় প্রকার জোঁকের ব্যবহারের যে চমকপ্রদ বিবরণ সুশ্রুত দিয়েছেন,[৬৯] তা প্রাচীন ভারতীয় প্রাণিবিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার গভীরতা বুঝিয়ে দেয়। অন্যদিকে চরক ও সুশ্রুত সংহিতা প্রাণীজ খাদ্য দ্রব্যাদির পুষ্টি গুণের যে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ দিয়েছে তা ভারতীয় প্রাণিবিজ্ঞান চর্চার ঐশ্বর্যস্বরূপ। উটের দুধের বিশেষ তারিফ করে চরক বলেন এটি কফ, বায়ু, ক্রিমি ও অর্শনাশক; অন্যদিকে মোষের দুধ নিদ্রাহীন ব্যক্তির পক্ষে ঘুমের ওষুধের মত কাজ করে। গরুর দুধের ক্ষেত্রে চরকের রায় হল একটি জরা ০ব্যাধিনাশক এবং প্রাণী দুদ্ধের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।[৭০] দোহনের সময় ভেদে গরুর দুধের ভিন্ন ভিন্ন পুষ্টি গুণ সম্পর্কে চরকের বিশ্লেষণ হল তৎকালীন প্রাণিবিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রমাণ। তাঁর মতে, সকালের দুধ হজন সহায়ক, শুক্রানুবর্ধক; দুপুরের দুধ শক্তি প্রদক, যকৃত শোধক, শিশুর বৃদ্ধি সহায়ক আর রাত্রের দুধ বিভিন্ন রোগ নাশক।[৭১] অন্যদিকে সুশ্রুত সংহিতায় বলা হয়েছে দই হজম সহায়ক, অর্থ, জন্ডিস, উদরাময় ইত্যাদি রোগ নির্মূলকারক।[৭২] আবার চরক বলেন খাদ্য গুণের সাপেক্ষে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির মধ্যে ঘি সেরা। এটি স্মৃতি, বুদ্ধি, শুক্রানুবর্ধক;ঘি পুরনো হলেও তার গুণাগুণ কিছু কমেনা, বরং তা মূর্ছা যাওয়া, মাথা ব্যাথা এবং বিষক্রিয়া নিরাময়ে বিশেষ উপকারী।[৭৩] গরুর পাশাপাশি ছাগল, ভেড়া, মোষের দুধের ঘিও যথেষ্ট ঔষধি গুণ সম্পন্ন বলে উল্লেখ করেন চরক। স্বভাবতই দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির এইরূপ বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রাণিবিজ্ঞান মনস্কতা ও চর্চারই নিদর্শন।

আবার বিভিন্ন প্রাণীর মাংসের ঔষুধি গুণ সম্পর্কে চরকের বিধান অত্যন্ত বাস্তব সম্মত। চরক সংহিতা অনুযায়ী গোমাংস বায়ুরোগে, তীব্র জ্বর, শুষ্ককাশি, পরিশ্রমজনিত ক্লান্তিতে ভীষণ উপকারী। কচ্ছপের মাংস চোখে জ্যোতি, মেধা স্মৃতি ও বলবর্ধক এবং বাত ও যক্ষানাশক।[৭৪] বস্তুত সেই কোন কালে চরক বলে গেছেন শরীর পোষকের মধ্যে মাংসাপেক্ষা অন্য কোন খাদ্য শ্রেষ্ঠ নয়! এমনকি গবাদি পশুর মূত্রের গুণাগুনও চরকের অনুসন্ধানী চোখ এড়িয়ে যায়নি। চাই চরক সংহিতায় উঠে আসে জন্ডিস, অর্শ, কুষ্ঠ, কৃমি প্রভৃতি রোগে গবাদি পশুর মূত্রের ব্যবহারের কথা।[৭৫] অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রাচীন ভারতে প্রাণিবিজ্ঞান চর্চায় প্রাণিকুলের সঙ্গে মানুষের মিথোস্ক্রিয়া সম্পর্ক বেশ গুরুত্ব পেয়েছিল।

১০

গুপ্তযুগে প্রাণিবিজ্ঞানের বিকাশের ধারা বিভিন্ন বাবে চোখে পড়ে। বিষ্ণুশর্মা রচিত 'পঞ্চতন্ত্র'-এর বিভিন্ন প্রাণী চরিত্রে মানবিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে প্রাণীদের মানব সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া

হয়েছে। 'বিষ্ণু সংহিতা'য় হাতি, ঘোড়া উটের হত্যাকারীর শাস্তি যথেষ্ট কঠোর। প্রাণী চিকিৎসা বিজ্ঞানও এপর্বে বিশেষ উন্নতি করে। হস্তি বিশেষজ্ঞ হিসাবে পলাকল্প রচনা করেন 'গজ আয়ুর্বেদ'।[৭৬] তিনি হাতির ব্যাধিকে আঘাত জনিত, শারীরিক, মানসিক প্রভৃতি ভাগে ভাগ করেন। অন্যদিকে হাতির চিকিৎসাকে মহারোগ, ক্ষুদ্ররোগ, শল্য চিকিৎসা ও ঔষধি চার ভাগে ভাগ করেছেন। শুধু তাই নয়, এই মূল্যবান গ্রন্থে হাতির বিভিন্ন প্রজাতি, অ্যানাটমি, চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে শুরু করে তাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নথিভুক্ত হয়েছে।[৭৭] আবার হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায়, সমুদ্রগুপ্তের সেনাবাহিনীতে হাতির পাশাপাশি গোড়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশিদারী ছিল, যার নিশ্চিত সমর্থন মেলে সমুদ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রায় দন্ডায়মান অস্বের একটি প্রতিকৃতি থেকে।[৭৮] আসলে শুধু সাহিত্যেই নয়, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনেও রযেছে গুপ্ত যুগের প্রাণিবিজ্ঞান চর্চার যথেষ্ট ঈঙ্গিত। তাই প্রতম কুমার গুপ্তের মুদ্রায় তাঁকে একটি ময়ুরকে খাবার দিতে দেখা যায়।[৭৯] তাছাড়া গুপ্তদের সীলে বারবার কুঁজযুক্ত ষাঁড়েরও দেখা মেলে। তাই সহজেই একথা বলা যায় গুপ্ত আমলেও প্রাণীরা যতেষ্ট গুরুত্ব পেত। অন্যদিকে ফা-হিয়েনের বিবরণ অনুযায়ী গুপ্তযুগে কোন কষাইখানা ছিল না, কেউ প্রাণী হত্যা করত না![৮০] ফা-হিয়েনের এই বক্তব্যের কিছুটা বাড়াবাড়ি বাদ দিলেও একথা বলা যেতেই পারে গুপ্তযুগে প্রাণিবিজ্ঞান চেতনা ও চর্চার যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছিল।

## ১১

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সাথে অবিচ্ছেদ্য রূপে জড়িয়ে রয়েছে প্রাণিবিজ্ঞানের নানা শাখা প্রশাখা। দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রাণিবিজ্ঞান চেতনা ও চর্চা হয়ে উঠেছে ভারতীয় সংস্কৃতির নিজস্ব অঙ্গ। একদিন খাদ্যের প্রয়োজনে মানুষ যাকে অবাধে শিকার করেছে, ধীরে ধীরে সেই পশুকেই সযত্নে প্রতিপালন করেছে, তার সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে, বংশ বিস্তারে সাহায্য করেছে, এমনকি তার চিকিৎসার কৌশলও আয়ত্ত করেছে। আবার প্রাণিসম্পদের অর্থনৈতিক মূল্য সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে। ফলে প্রাণিবিজ্ঞান পৌঁছে গেছে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তঃস্থলে।

***তথ্যসূত্রঃ***


১। A.K. Sharma (Ed.), *History of Science in India*, The National Academy of Sciences India and The Ramakrishna Mission Institute of Culture , Kolkata, Vol. in, part II, 5.

২। Shefalika Ghosh Samaddar, *Primitive Picassos of Bhimbetka*, Science and culture, Vol. 76, INSA, New Delhi, 2010, 103.

৩। Upinder Singh, *A History of Ancient and Early Medieval India : From The Stone Age to the 12th Century*, Pearson Education India, New Delhi, 2009, 92

৪। *Ibid.*, 90.

৫। রণবীর চক্রবর্তী, *ভারত ইতিহাসের আদি পর্ব (প্রথম খণ্ড)*, ওরিয়েন্টলংম্যান, কোলকাতা, ২০০৭, ৩৮।

৬। Rita P. Wright, *The Ancient Indus: Urbanism, Economy, and Society*, Cambridge University Press, New Delhi, 2010, 49.

৭। Dilip K. Chakrabarti, *India and Archaeological History*, Oxford University Press, New Delhi, 2006, 112.

৮। *Ibid.*, 123

৯। Irfan Habib, *The Indus Civilization : A People's History of India 2*, Tulika Books, New Delhi, 2003, 28.

১০। *Ibid.*, 28.

১১। Rita P. Wright, Op cit., 208.

১২। *Ibid.*, 172

১৩। Irfan Habib, op. cit., 28

১৪। Upinder Sing, op.cit., 157.

১৫। Irfan Habib, op.cit., 49

১৬। A.L. Basham, *The Wonder That Was India*, Rupa. Co., New Delhi, 2002, 21.

১৭। Rita P. Wright, op.cit., 289.

১৮। A.L. Basham, op.cit., 21.

১৯। রণবীর চক্রবর্ত্তী, *পূর্বোক্ত*,১৯

২০। Mira Roy, *Agriculture in the Vedic Period*, Indian Journal of History of Science, Vol. 44.4(2009), INSA, New Delhi, 512

২১। দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঝাঁ, *হিন্দু শাস্ত্রে গো মাংস ভক্ষণ*, ভাষান্তর সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌমি বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কোলকাতা, ২০১৮, ৮।

২২। ঐ, ১১।

২৩। Mira Roy, op.cit., 502

২৪। রামশরণ শর্মা, *আর্যদের অনুসন্ধান*, অনুবাদক ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, লোককাতা, ২০১৫, ২২।

২৫। রণবীর চক্রবর্তী, *পূর্বোক্ত*, ১০৭।

২৬। M.S. Randhawa, *A History of Agriculture in India*, Indian Council of Agricultural Reserarch, Vol. I, New Delhi,1980, 293.

২৭। রোমিলা থাপার, *ভারতবর্ষের ইতিহাস ১০০০ খ্রিঃ পূর্বথেকে ১৫২৬ খ্রিঃ*, অনুবাদক কৃষ্ণা গুপ্ত, ওরিয়েন্ট ব্লাংম্যান, কোলকাতা, ১৯৬০, ২৭।

২৮। Priyadaranjan Ray, *Zoology in Ancient and Medieval India*, The Cultural Heritage of India, Priyadaranjan Ray & S.N. Sen, The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, Vol. vi, Science and Technology, 1986, 129.

২৯। E.D. Kulkarni (Ed.), *Salihotra of Bhoja*, Sources of Indo-Aryan Lexicography- II, Deccan College post Graduate and Research institute Pune, 1953, vii.

৩০। Monica Meadows, *The Horse: Conspicuous Consumption of Embodied Masculimity in South Asia*, 1600-1850, A Submitted Dissertation for PhD in University of Washington, 2013,35.

৩১। Dr. Sandip Joshi, *Asvasastram and Illustrated Book of Equinology*, Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University, Jaipur, 2008, xxi.

*ভারতীয় অশ্ব চিকিৎসার ইতিহাসে শালিহোত্র সংহিতাকে কেবল প্রাচীন কালেই নয় বংর যুগ পরম্পরায় অনুসরণ করা হয়েছে। আদি-মধ্য যুগের অন্যতম ঐতিহাসিক উপাদান হর্ষচরিতে বাণভট্ট উল্লেখ করেছেন ঘোড়ার রোগের লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের জন্য শালিহোত্র সংহিতার নির্দেশ পালন করা হত (C.V. Vajdya, Hostory of Mediaeval Hindu India, Vol. 1, 1st ed., The Oriental Book Supplying Agencey, Pune City, 1921, 143) অন্যদিকে একাদশ শতকে মালবের পারমার বংশীয় বিদগ্ধ পণ্ডিত রাজা ভোজা (১০১০-৫৫) শালিহোত্র সংহিতা অবলম্বনে রচনা করেন অশ্ব চিকিৎসার আরও একটি গ্রন্থ, যা ভোজরাজ বিরোচিত শালিহোত্র নামে পরিচিত (E.D. Kulkarni (Ed.), Salihotra of Bhoja, Sources of Indo-Aryan Lexicography-II Deccan College Post Graduate and Research Institute Pune,1953) পরবর্তীতে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ মূঘল সেনাপতি খান বাহাদুর ওরফে ফিরোজ জঙ্ ' অশ্বশাস্ত্র বা শালিহোত্র সংহিতার পার্শি অনুবাদ করেন এবং নামকরণ করেন 'তর্যমা-ই-আসবান্' বা 'ফরাসমামা -ই-হিন্দি' (R.B. Azad Choudhury, The Mughal and the Late Mughal Equine Veterinary Literature : The Tarjamah-i-Rangini, Social Scientist,

Vol. 45, 2017, 56)। বস্তুত মুঘল আমলেও উপযুক্ত ঘোড়া নির্বাচন থেকে শুরু করে ঘোড়ার চিকিৎসার ক্ষেত্রেও শালিহোত্র সংহিতার গুরুত্ব একই ভাবে বহাল ছিল। এমনকি ঔপনিবেশিক পর্বেও দেশীয় অশ্ব চিকিৎসা পদ্ধতির আধার স্বরূপ এই গ্রন্থের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ১৭৭৮ খ্রিঃ জোসেফ আর্লিস নামক ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক কর্মচারী শালিহোত্র সংহিতার ইংরেজি অনুবাদ করলে গ্রেট ব্রিটেনেও এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় (Joseph Earles, A Treatise on orses, Entitled Saloter : A Complete System of Indian Farriery in Two Parts, Calcutta : George Gordon, 1778)। এমনকি ১৮৫০ থেকে ১৯০৫ এর মধ্যে ডি. সি. ফিলট শালিহোত্র সংহিতার উপর াধারিত কমপক্ষে পাঁচটি পার্শি গ্রন্থের ইংরেজি অনুপাদ প্রকাশ করেন। ফলে সামগ্রিক ভাবে দেখা যায় ভারতীয় অশ্বচিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারাবাহিক ইতিহাসে বৈদিক ঋষি শালিহোত্রের সৃষ্টি অশ্বশাস্ত্র বা শালিহোত্র সংহিতার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

৩২। S. Gopalan (Ed.), Asvasastram by Nakula, with Coloured Illustrations, Saraswathi Mahal Libary, Tanjore, 1952.

৩৩। Dr. Sandip Joshi, op.cit., xxix

৩৪। Animal Characters in the Jatakas, 58-63, shodhganga. in flibnet. ac. in, accessed on 15/03/19.

৩৫। Animal Versus Humans: A Buddhist Perspective, 24, shodhganga. inflibnet ac.in, accessed on 15/03/19

৩৬। *Ibid*.

৩৭। M.R. Raghava Varier, *Origins and Growth of Ayurvedic Knowledge*, Indian Journal of History of Science, 51.1. (2016, INSA, New Delhi, 44.

৩৮। Upinder Singh, op.cit., 273.

৩৯। *Ibid.*, 271.

৪০। Upinder Singh, *Political Violence in Ancient India*, Harvard University Press, England, 2017, 265.

৪১। R.P. Kangle, *The Kautiliya Arthasastra*, Part II, University of Bombay, 1963, 181.

৪২। R. Shamasastry, *Kautilya's Arthashastra* Translated into English, 174, https://archive.org>details>Arthasastra,accessed on 16/03/19

৪৩। *Ibid.*, 183.

৪৪। *Ibid.*, 188

৪৫। M.S. Randhawa, op. cit., 372

৪৬। R.P. Kangle, op. cit., 193

৪৭। M.S. Randhawa, of.cit., 372

৪৮। R.P. Kangle, op.cit., 193

৪৯। R. Shamasastry, op.cit., 189

৫০। *Ibid.*, 190

৫১। *Ibid.*, 189

৫২। *Ibid.*, 191

৫৩। R.P. Kangle, op.cit., 200

৫৪। *Ibid.*, 202

৫৫। *Ibid.*, 203

৫৬। *Ibid.*, 204

৫৭। গৌরীশঙ্কর দে, শুভ্রদীপ দে, *প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি*, সেতু প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০১৩, ৮৯।

৫৮। Romila Thapar, *Asoka and The Decline of The Mauryas*, Oxford University Press, Oxf
৫৯। Radhakumud Mookerjii, *Asoka*, Macmillan and Co. Limited, London, 1928, 132
৬০। Romila Thapar, op.cit., 264
৬১। S.L. Hora, *Knowledge of the Ancient Hindus Concerning Fish and Fisheries of India-Fishery Legislation of Bengal : Letters,* 1950, xvi (1), 43-56.
৬২। M.S. Randhawa, op.cit., 368
৬৩। Priyadarsan Sensarma, *Conservation of Binodiversity in Manu Samhita*, Indian Journal of History of Science, 33(4) 1998, INSA, New Delhi, 270
৬৪। *Ibid.*
৬৫। Priyadarsan Sensarma, *Conservation of Biodiversity in Manu Samhita*, Indian Journal of History of Science, 35(1) 2000, INSA, New Delhi, 30.
৬৬। *Ibid.*, 35.
৬৭। ব্রজেন্দ্রনাথ নাগ (সম্পা), *চরক সংহিতা*, নবত্র প্রকাশন, সংখ্যা ১, কোলকাতা, ১৯৮৪, ২৯৭।
৬৮। গৌরীশঙ্কর দে, শুভ্রদীপ দে, *পূর্বোক্ত*, ৮৬।
৬৯। ঐ
৭০। ব্রজেন্দ্রনাথ নাগ, *পূর্বোক্ত*, ৮৬।
৭১। V. B. Singh, *Dairying in Ancient India, Agricultural Heritage of India*, Asian agri-History Foundation, Y.L. nene (Ed.), 2007, 165-76.
৭২। *Ibid.*
৭৩। ব্রজেন্দ্রনাথ নাগ, *পূর্বোক্ত*, ৩১৯।
৭৪। ঐ, ৩০০-৩০১।
৭৫। ঐ, ১৪।
৭৬। Upinder Singh, *A History of Ancient and Early Medical India : From The Stone Age to The 12th Century*, Pearson Education India, New Delhi, 2009, 544.
৭৭। সিদ্ধার্থ জোয়ারদার ও অনিন্দিতা জোয়ারদার, *আধুনিক জীববিদ্যা ও জনস্বাস্থ্যের সহজ পাঠ*, গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদ, ২০১৭,৯০।
৭৮। M.S. Randhawa, op.cit., 410
৭৯। *Ibid.*
৮০। *Ibid.*, 412